সংবাদ পরিষেবা | জানুয়ারি ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

চাষির আয় কমছে, ডুবছে গ্রামীণ অর্থনীতি

২৮/৩৮

সুব্রত কুণ্ডু

২০২২ ছিল চাষির আয় দ্বিগুণ হওয়ার বছর। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬-এ, উত্তরপ্রদেশের বেরিলির কৃষক সমাবেশে, প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা করেছিলেন। এজন্য অশোক দলওয়াইয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। ১৪টি খণ্ডে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার বেশ মোটাসোটা প্রস্তাব জমা করেছিল এই কমিটি। আর চাষির আয় বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে কোনো 'স্পষ্টতা' না থাকায়, এ নিয়ে নীতি আয়োগের রমেশ চন্দ্র একটি পলিসি পেপার প্রকাশ করেন। এই পেপার অনুযায়ী আয়ের ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ২০১৫-১৬ সালকে ধরা হয়েছিল। সেই হিসেবে ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১-এর মধ্যে চাষির আয় গড়ে প্রতি বছর ১.৫ শতাংশ হারে কমেছে।

অশোক দলওয়াই কমিটি, ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকাল অফিস (এনএসও) এর সিচুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে (এসএএস)-এর ব্যবহৃত 'চাষির' একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। এই হিসেবে চাষি পরিবারের সমস্ত আয়-ব্যবসা থেকে আয়, অ-কৃষি আয় এবং শ্রম মজুরিও ধরা হয়। এসএএস-এর ওপর ভিত্তি করে হিসেব করলে দেখা যায়, ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯ এর মধ্যে ফসল চাষ থেকে চাষি পরিবারের আয় বার্ষিক ১.৫ শতাংশ হারে কমেছে। এই হিসেবে যদি পশু সম্পদ থেকে আয়কে যোগ করা হয় তবে তা, বার্ষিক ০.৬ শতাংশ হারে বাড়ে। আর অ-কৃষির আয় যোগ করলে এই আয় বেড়ে ২.৮ শতাংশ হবে। ২০২২-২৩ এর কোনো হিসেবে এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এটা বলা যায়, এই হার খুব একটা বাড়ার সম্ভাবনা নেই। কৃষি এবং অ-কৃষি কাজের হিসেব ধরলেও চাষি পরিবারের আয় দ্বিগুণ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে অ-কৃষি কাজ থেকে আয় এটা প্রমাণ করে যে, কৃষি পরিবারগুলি ক্রমশ চাষের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলছে। কৃষি কাজ ছেড়ে দেওয়া চাষিদের হিসেব দেখলেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষি পরিবারের আয়ের তথ্যের অন্য উৎস হল নাবার্ডের অল ইন্ডিয়া ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন সার্ভে (বা নাফিস)। যদিও এখানে কৃষি পরিবার এবং আয়ের সংজ্ঞা এসএএস-এর থেকে আলাদা। নাফিসের তথ্য অনুযায়ী, সমস্ত উৎস থেকে কৃষি পরিবারের বার্ষিক আয় ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ বেড়েছে ১.৭ শতাংশ হারে। এর আগে নাফিসের হিসেব অনুযায়ী ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬ অবধি বার্ষির আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮ শতাংশ। অর্থাৎ এই হিসেবের পেক্ষিতে পরবর্তী বছরগুলিতে চাষির আয় কমেছে।

তথ্যের অভাবের কারণে গত ৫ বছরে চাষিদের নিট আয় কী হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে বলা বেশ মুশকিল। কিন্তু একাধিক সূত্র ব্যবহার করে যেটুকু অনুমান করা যায় তা হল, উৎস বা পদ্ধতি নির্বিশেষে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের পর দেশে দ্বিগুণ তো দূর চাষিদের আয় কমেছে।

এখানে সমস্যা শুধু চাষিদের আয় কমা নয়। আয় কমেছে গ্রামীণ শ্রমিকদেরও। এই গ্রামীণ শ্রমিকদের বেশিরভাগই কৃষি কাজে যুক্ত। গ্রামীণ প্রকৃত মজুরিও গত ৫ বছরে কমেছে। নির্দিষ্টভাবে বললে চারভাগের তিনভাগ গ্রামীণ শ্রমিকের আয় কমে যাচ্ছে।

এই আয় কমা, গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এতে গ্রামীণ মানুষের চাহিদাও কমছে। এর সঙ্গে ক্রমশ বাড়তে থাকা মুদ্রাস্ফীতির জন্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। আর সেজন্যই গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে অর্থবহ পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগ দরকার। মতামত নিজস্ব

জিন ফসল ঃ সরষের পর আবার বেগুন ২৮/৩৯

মহারাষ্ট্রের এক বীজ কোম্পানি বীজো শীতল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জনক এবং বিএসএস ৭৯৩ নামে প্রথম ফিলিয়াল প্রজন্মের হাইব্রিড বেগুনের জাত তৈরি করেছে। এই বিটি অর্থাৎ জিন পরিবর্তিত জাতগুলি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইএআরআই) মাধ্যমে উন্নত ট্রান্সজেনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। বীজো শীতল সংস্থাটি কর্ণাটকের বাগালকোট ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচার সায়েন্সকে এই বীজ পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছে। সংস্থাটি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এই বীজের পরীক্ষা করার অনুমতি চেয়েছে। ডাউন টু আর্থ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

উল্লেখ্য, জিন পরিবর্তিত বা জিএম সরষে কেন্দ্রের পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১১ সালে বিটি বেগুনের ওপর একটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতাদেশ আরোপ করে। আশঙ্কা হল, এই সূত্রে এবার আরো কোম্পানি নানারকম জিএম ফসলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চাষের জন্য অনুমোদন চাইবে।

কোম্পানিটির মতে, ফল ও কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার উপদ্রবে ফসল অনেক কমে। কিন্তু বিটি বেগুনের চাষ করলে এই পোকার আক্রমণ ৯৭ শতাংশ গাছে হবে না। কারণ বিটি বা ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েন্সিস (বিটি) নামের ব্যাক্টেরিয়ার বিষ নির্গতকারী জিন এই বেগুনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে পোকা আর বেগুন নষ্ট করতে পারবে না। এজন্য কীটনাশকের ব্যবহারও কমে যাবে।

মনে রাখা দরকার, একই কথা বলা হয়েছিল বিটি তুলোর চাষের ক্ষেত্রেও। কিন্তু দেখা গেছে তুলোর পোকা কমেনি। উল্টে বীজের দাম এবং চাষের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই বীজ রেখে চাষ করা যায় না, ফলে বছর বছর বেশি দাম দিয়ে বীজ কিনতে হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশে এবং মানবদেহে এর প্রভাব সম্পর্কে কোনো সমীক্ষা হয়নি। বিভিন্ন দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বারবার এই বীজের ক্ষতিকর দিকগুলি প্রমাণিত হয়েছে। ফলে ইউরোপের প্রায় সব দেশে জিন ফসল চাষ বন্ধ করা হয়েছে।

নেশাগ্রস্ত শৈশব ও কৈশোর ২৮/৪০

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে উদ্বেগজনক সংখ্যায় তরুণ তরুণীরা অ্যালকোহল, গাঁজা বা আফিমের আসক্তিতে ভুগছে। আর নেশাগ্রস্ত চারজনের মধ্যে তিনজনই চিকিৎসা পাচ্ছে না।

গত ১৪ ডিসেম্বর সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানায় যে, ভারতে ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় এক কোটি ৫৮ লাখ শিশু ও কিশোর বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্যে আসক্ত। ভারতের ন্যাশনাল ড্রাগ ডিপেন্ডেন্স ট্রিটমেন্ট সেন্টারের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে। এই সমীক্ষা হয়েছিল ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে। দেশের ১০টি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং ১৫টি এনজিও'র সহযোগিতায় ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই সমীক্ষা করা হয়।

সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নেশার দ্রব্য মদ, এরপর গাঁজা ও আফিম। এছাড়া কোকেনসহ অন্য

মাদকদ্রব্যও এদেশে ব্যবহৃত হয়। যেসব রাজ্যে গাঁজার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিকিম এবং ছত্তিশগড়। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাস্তবে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কঠোর ড্রাগ কন্ট্রোল আইন এবং সারা দেশে ওষুধের নিয়ন্ত্রণের অনেক সংস্থা কাজ করলেও বিভিন্ন ধরনের ওষুধও মাদক দ্রব্য হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

বচপন বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষ থেকে শিশুদের মধ্যে মাদকের সেবন বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার সূত্রেই মাদক নিয়ে এসব তথ্য জানা গেছে।

উৎপাদন বেড়েছে ডাল, তেলের ২৮/৪১

২০১৯-২০ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে দেশে ডাল শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন। এই সময়কালে তেলবীজ উৎপাদন বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন। লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীর সহ ২৮টি রাজ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনের সহায়তায় ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, পুদুচেরী সহ ২৫টি রাজ্যে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে তেলবীজ প্রকল্পের আওতায় চাষিদের নানা ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে চাষিদের কাছে কৃষিকাজে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, নতুন প্রজাতির ডালশস্য ও তেলবীজ সরবরাহ করার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজ্যসভার গত শীতকালীন অধিবেশনে এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

আদিবাসী উন্নয়নে কেন্দ্র ২৮/৪২

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানোন্নয়ন, তাঁদের সংস্কৃতি রক্ষা করা, আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্র বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২০'র জাতীয় শিক্ষা নীতিতে স্থানীয় ভাষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সুফল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পাবেন। দেশের বিভিন্ন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ১ লক্ষেরও বেশি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আদি আদর্শ গ্রাম যোজনার আওতায় ৩৬ হাজার ৪২৮টি গ্রামে নানা সংস্কারমূলক কাজ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বছরে ৭ হাজার ৫০০টি গ্রামকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছর ধরে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হবে। এসএফইউআরটিআই প্রকল্পের আওতায় ২৭৩টি ক্লাস্টার তৈরি করা হয়েছে। এই ক্লাস্টার থেকে প্রাপ্ত পণ্য সামগ্রী বন ধন কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি বিক্রি করতে পারবে। মিলেট বা জোয়ার, বাজরা ও রাগিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়। ২০২৩ হল আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার বেশ ধুমধান করে এই বর্ষ পালনের উদ্যোগ নিয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী নেতাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কেন্দ্র বিভিন্ন স্থানে বিশেষ সংগ্রহশালা গড়ে তুলছে, যেখানে আদিবাসী সমাজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাসের কথা জানানো হবে। এছাড়াও, প্রতি বছর জনজাতীয় গৌরব দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রথম জাতীয় আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে আদিবাসীদের বিভিন্ন তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকবে।

দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানোন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এইসব উদ্যোগের কথা নতুন দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে, মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, ২০১৪-১৫ সালে

আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা। আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে ৮ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা।

কমলায় স্বাস্থ্য **২৮/৪৩**

শীতকালীন ফল কমলালেবুর রস খুবই জনপ্রিয়। ফলের স্যালাডে এবং বিভিন্ন মিষ্টিতেও এর ব্যবহার রয়েছে। এর খোসা থেকে তেল বা অরেঞ্জ অয়েল পাওয়া যায় যা বিভিন্ন খাবারে গন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কমলালেবুর খোসা দিয়ে পানীয় এবং সুগন্ধী তৈরি হয়। ভ্যানিলা ও চকলেটের পর সারা বিশ্বে জনপ্রিয় সুগন্ধী এই ফল থেকে তৈরি হয়। কমলা ফুলের পাপড়ি দিয়ে অরেঞ্জ ওয়াটার তৈরি হয়। কমলা'র পাতা জলে সেদ্ধ করে তৈরি করা হয় ভেষজ চা। কমলালেবু থেকে আচার ও জেলিও তৈরি করা হয়। এত গেল খাবার হিসেবে কমলার কথা। তবে এর নানা রকম ঔষধি গুণও রয়েছে।

অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, ভিটামিন, ফাইবার বা আঁশ ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ কমলালেবু ত্বক, চোখ এবং হৃৎপিণ্ড ভালো রাখার জন্য আদর্শ ফল। এটি নিয়মিত খেলে শরীরে ক্যানসার কোষ বাড়তে পারে না বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন। এই লেবুতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট যা চোখের জন্য ভালো। এই ফলটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বককে বাঁচায় ও বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।

এই ফলে প্রচুর ভিটামিন এ এবং সি থাকে। এ দুটো ভিটামিনই খুবই শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া হৃদয় সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। কমলায় ক্যালোরির পরিমাণ খুব কম। এতে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা সম্পৃক্ত চর্বি নেই। এই লেবুতে রয়েছে প্যাকটিন-একটি ডায়েটারি ফাইবার বা খাদ্য তন্তু যা শরীরের অতিরিক্ত ওজন ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে। এতে আরো রয়েছে হেসপারেটিন, নারিনজিন ও নারিজেনিন ফ্লেভোনয়েড এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ব্যথা বেদনা কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু